

ছোট গল্প

দর্পহরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কী করিয়া গল্প লিখিতে হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি । বঙ্কিমবাবু এবং সার ওয়াল্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই । ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল , আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম ।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল ; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই । আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি ; তখন আমি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি – এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনির্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে , কম্পনে এবং মর্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল , তাহা এখনো মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে ।

তখন আমার মা ছিলেন না – আমাদের শূন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশোনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই , বাবা বারো বৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন ।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি । কারণ , তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে – অনেকে ইন্সকুলমাস্টারি মুন্সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকিও করেন, তাঁহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাসিবেন এমন আশঙ্কা আছে । কিন্তু আমি তখন অর্বাচীন ছিলাম , বিচারশক্তির কোনো উপদ্রব ছিল না , তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি গুনিলাম অমনি –

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো ,

আকুল করিল মোর প্রাণ ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্সেফি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি , তবু হৃদয়ের মধ্যে ঐ নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মতো আরো বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে ।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধুর । লজ্জার বাধা , ঘরের লোকের বাধা , অনভিজ্ঞতার বাধা- এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন- তাহা মধ্যাহ্নের মতো সুস্পষ্ট , অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে ।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিদ্যুৎগিরির মতো দাঁড়াইলেন । তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । আমার এই গল্পের শুরু হইল সেইখানে ।

শ্বশুরমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না , তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন । এমন-কি , উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল । মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না ।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম । আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম । তাহাতে কোটেশন-মার্ক না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম ; ভাবিয়াছিলাম – প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে , শ্রদ্ধাও চাই । শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া

উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না , সেইজন্য মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রসেবাস্তি মে গতিঃ । অর্থাৎ , অন্য জহরির য়ে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন , আমার চিঠি তাহা সূত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত । কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের , কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার , এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই – কালিদাসও করিতেন না , যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই মাল হইত ।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্ক দিতে আর কার্পণ্য করি নাই । এটুকু বেশ বোঝা গেল , নববধূ বাংলাভাষাটি বেশ জানেন । তাঁহার চিঠিতে বানান-ভুল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই- কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না , সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি ।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে , কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অন্য ভাবও ছিল । সে ভাবটুকু উচ্চদের না হইতে পারে , কিন্তু স্বাভাবিক । মুশকিল এই যে , যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম । সে যেটুকু ইংরেজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত – মশার কিছুই হইত না , কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত ।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না । তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল , “ এমন স্ত্রী পাইয়াছ , ইহা তোমার ভাগ্য । ” অর্থাৎ , ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই ।

নির্বিরণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্বেই যে কখানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল , কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না । সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই । সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয়তো কিছু কম পড়িত , কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত ।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ । সুতরাং , বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত । ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চায় যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম । বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না , এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ – বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারংবার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি ।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠতুতো বোনের বিবাহকাল উপস্থিত – আমরা তো যথানিয়মে আইবুড়োভাত দিয়া খালাস , কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না । সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল । বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য, সদ্ভাবসৌন্দর্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন । তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন , তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন , “ খাসা হইয়াছে! ” নববধূর যে রচনাশক্তি আছে এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না । হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ; অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল । পূর্বেই বলিয়াছি , কোনো জিনিস একেবারে বিলুপ্ত হয় না – কী জানি , লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে ।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই । অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই । বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন , আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি । আমি ইংরাজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই । সে কোকিলের উপর একটা-কী লিখিয়াছিল , আমি শেলির স্কাইলার্ক ও কীটসের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম । তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীটসের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম । আমার স্ত্রীও ইংরেজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত , আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম । তখন ইংরেজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই । স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার , বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না – কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল । নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে , কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয় , ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে ।

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন । নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত – আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি । কাগজে ছাপিতে দিই নাই , কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না ।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে , কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম । তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই । একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম । উইলটি

বাংলায় লেখা । স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম , এমন সময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন , “ আমার বিদ্বান বন্ধু যদি তাঁহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইলটি বুঝিয়া লইয়া আসিতেন , তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না । ”

চুলায় আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয় , কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায় । লোকের ভালো কথা চাপা থাকে , আর অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হুঃ শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায় । এ গল্পটিও সর্বত্র প্রচারিত হইল । ভয় হইয়াছিল , পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে । সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই – অন্তত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনো শুনি নাই ।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন , “ আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী । ” আমি কহিলাম , “ আমি তাঁহার স্বামী কি না সে কথার জবাব দিতে চাহি না , তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন । ” বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি নাই ।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে , সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল । পূর্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন , আমার স্ত্রীর জাঠতুতো বোনের বিবাহ হইয়াছে । তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দুর্বৃত্ত । স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য । আমি এই পাষন্ডের নির্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম , সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল । সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে , নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে

লিখিয়াছে , কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই ।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে । বিশেষত বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল , নির্ঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন । একদিন তিনি বলিলেন , “ হরিশ যে-বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন বউমা- আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে , তাহাতে সে ‘ জগদিন্দ্র ‘ লিখিতে দীর্ঘ ঙ বসাইয়াছে । ” শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন । আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম , কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয় ।

স্ত্রীর দম্ভের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না । পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে ; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল । অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয় ; তিনি বক্তৃতার পূর্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন । ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল । আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম । বলিলাম , “ তা বেশ তো , বিষয়টা কী বলো তো । ”

তাহারা কহিল , “ প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য । ”

আমি কহিলাম , “ বেশ হইবে , দুটোই আমি ঠিক সমান জানি । ”

পরদিন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম । নির্ঝরিণী কহিল , “ কেন গো , এত ব্যস্ত কেন – আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ । ”

আমি কহিলাম , “ একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি ; আর নয় । ”

“ তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে । ”

স্ত্রীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম । শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল । কহিল , “ তুমি পাগল হইয়াছ ? না না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না । ”

আমি কহিলাম , “ রাজপুতনারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত – আর বাঙালির মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না । ”

নির্বরিণী কহিল , “ ইংরেজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না , কিন্তু – থাক্ না , অনেক লোক আসিবে , তোমার অভ্যাস নাই – শেষকালে – ”

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই । রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল –

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর ,

অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর ।

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ ‘ দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর ‘ অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কী গতি হইবে । এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল , এমন কথা আমি বলিতে পারি না ।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম , “ নিব্বার , তুমি কি মনে কর –”

স্ত্রী কহিল , “ আমি কিছুই মনে করি না- কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা ধরিয়া আসিয়াছে , বোধ হয় জ্বর আসিবে , তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না । ”

আমি কহিলাম , “ সে আলাদা কথা । তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে । ”

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দূরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায় অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে , সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম ।

বলা বাহুল্য , স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল । আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল , ‘ আর সব ভালো হইল , কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার , এটা ভালো নয় । তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন – কোনোদিন-বা মশারির মধ্যে নাইট-স্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন । ’

আমি কহিলাম , “ ঠিক কথা- এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না । ”

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম । অল্প শিক্ষা যে কিরূপ ভয়ংকর জিনিস , পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম । ইহাও বুঝাইলাম , কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে – আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া । কাশিয়া বলিলাম , “ সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না- সেটার

জন্য মাথা চাই । ” মাথা যে কোথায় আছে সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই , কিন্তু তবু বোধ হয়, কথাটা অস্পষ্ট ছিল না । আমি কহিলাম , “ লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই । ”

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তর্কিকতা চড়িয়া উঠিল । সে বলিল , “ কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না । মেয়েরা এতই কি হীন । ”

আমি কহিলাম , “ রাগ করিয়া কী করিবে । দৃষ্টান্ত দেখাও-না । ”

নির্ঝরিণী কহিল , “ তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম । ”

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল , কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই । ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে ।

‘ উদ্দীপনা ’ বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারঘোষণা করিয়াছিল । কথা এই স্থির হইল , আমরা দুইজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব , দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে ।

রাত্রের ঘটনা তো এই । পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্মল হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল । কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম , এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না- যেমন করিয়া হউক , জিতিতেই হইবে । হাতে তখনো দুই মাস সময় ছিল ।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম , বঙ্কিমের বইগুলোও সংগ্রহ করিলাম । কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত , তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল । ইংরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে

লাগিলাম । অনেকগুলো গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম । প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল , কিন্তু মুশকিল এই হইল , বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না । অতিপ্রাচীন কালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম ; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রইল না । উদাম প্রণয় , অসম্ভব বীরত্ব , নিদারুণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল ।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম । আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বলিল , “ আমার মাথা খাও , তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না – আমি হার মানিতেছি । ”

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম , “ তুমি কি মনে করিতেছ আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি । কিছুই না । আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয় – তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কী ছিল । ”

যাহা হউক , ইংরেজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম । মনের কোণে ধর্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম – ভাবিলাম , বেচারী নিব্বার ইংরেজি সাহিত্য পড়ে নাই , তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই ।

উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে । বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে । যদিও আমার মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না , তবু সময় যত নিকটবর্তী হইল , মনটা তত চঞ্চল হইয়া উঠিল ।

বৈশাখ মাসও আসিল । একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম , বৈশাখের ‘ উদ্দীপনা ‘ আসিয়াছে , আমার স্ত্রী তাহা পাইয়াছে ।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম । শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম , আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটি বই পুড়াইতেছে । দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিনীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল , কিছু পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে ।

মনে আনন্দ হইল , কিন্তু সেইসঙ্গে একটু দয়াও হইল । আহা , বেচারার গল্পটি ‘ উদ্দীপনায় ‘ বাহির হয় নাই । কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ! স্ত্রীলোকের অহংকারে এত অল্পেই ঘা পড়ে ।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম । উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম । আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম । সূচীপত্র দেখিলাম , পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম ‘ বিক্রমনারায়ণ ‘ নহে , তাহার নাম ‘ ননদিনী ‘ , এবং তাহার রচয়িতার নাম – এ কী! এ যে নির্ঝরিনী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারো নাম নির্ঝরিনী আছে কি । গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম । দেখিলাম , নির্ঝরের সেই হতভাগিনী জাঠতুতো বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত । একেবারে ঘরের কথা – সাদা ভাষা ,

কিন্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায় । এ নির্ঝরিণী যে আমারই ‘ নিঝর ’ তাহাতে সন্দেহ নাই ।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লানমুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম ।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম , “ নিঝর , যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে সেটা কোথায় । ”

নির্ঝরিণী কহিল , “ কেন , সে লইয়া তুমি কী করিবে । ”

আমি কহিলাম , “ আমি ছাপিতে দিব । ”

নির্ঝরিণী । আহা , আর ঠাটা করিতে হইবে না ।

আমি । না , ঠাটা করিতেছি না । সত্যিই ছাপিতে দিব ।

নির্ঝরিণী । সে কোথায় গেছে, আমি জানি না ।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম , “ না নিঝর , সে কিছুতেই হইবে না । বলো , সেটা কোথায় আছে । ”

নির্ঝরিণী কহিল , “ সত্যিই সেটা নাই । ”

আমি । কেন , কী হইল ।

নির্ঝরিণী । সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি ।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম , “ অ্যাঁ , সে কী! কবে পুড়াইলে । ”

নির্ব্বারিণী । আজই পুড়াইয়াছি । আমি কি জানি না যে , আমার লেখা ছাই লেখা । স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে ।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিব্বারকে সাধ্যসাধনা করিয়াও এক ছত্র লিখাইতে পারি নাই ।

ইতি শ্রীহরিশচন্দ্র হালদার।

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গল্প । আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন , তাহা তাঁহার রচিত উপন্যাসটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না । ছিছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয় ? ইতি শ্রীনির্ব্বারিনি দেবী।

স্ত্রীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে – তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না । আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন , সে কথা আমি বলিব না – না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন । আমার স্ত্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন , সেগুলি ইচ্ছাকৃত – তাঁহার স্বামী যে বাংলায় পরমপন্ডিত এবং গল্পটি যে আঘাড়ে , ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন – এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন , স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম । তিনি স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন । আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছি । কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব । কালিদাসের সঙ্গে আরো একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি । শুনিয়াছি , কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার বিদুষী স্ত্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে র-ফলাটা লোপ করিয়াছিলেন – শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে

দর্পহরণ

– অতএব , সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে ,
কালিদাসের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল, আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে ।
ইতি শ্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয় , আমি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইব । শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিব । শ্রীহঃ